খণ্ড ১২, সংখ্যা ১৩-১৪ ভাবনগর জুন-ডিসেম্বর ২০২০
Vol. 12, No. 13-14 BHĀBANAGARA June-December 2020

নষ্ট আত্মার টেলিভিসন: ফালগুনী রায়ের কবিতার উপরে কিছু ভাবনা এবং ব্যাখ্যা

ডানিয়েলা কাপ্পেল্লো

সুবিমল বসাকের অংকনে ফালগুনী রায়

Television of a Rotten Soul: A Reading of Falguni Ray's Poetry

Daniela Cappello

Abstract

In this paper, I critically engage with some poems from Falguni Ray's collection *Television of a Rotten Soul* (1973). Falguni (1945-1981) was a cult figure in the Hungry Generation movement, the group of shocking and rebellious Bengali poets who were sentenced for obscenity in their writings. In many ways, Falguni is perhaps the best representative of the alienation and anxiety of postmodernity which stood behind the symbolic violence and perversion of this avantgarde movement's language.

Unemployed, alcohol-addicted and cirrhotic, Falguni died prematurely at the age of 36. In his poems, he has revealed the urgency and depravity of his sexuality, as well as the uneasiness with the dominant views and norms of Bengali society, only to expose the crisis of traditional social values and morality in India's shaping consumer culture. Some of his thoughts on language and heredity can be read as an anticipation of concerns that are typical of later postcolonial critique: with an always ironic tone, he harshly criticizes universal truths, especially targeting the sphere of (Western) scientific theories and their impact on individual experience.

In the same direction goes the poet's conflictual relationship with his body: his male body and his Bengali language, always in the liminal space of transgression and re-coding, are the focus of his postcolonial interrogation. Through these, the poet wanted to re-write the standard meanings of his 'Bengali language and culture', what the Hungryalists wanted to renew and revive, by making fun of hegemonic discourses on sex, caste, class and race that were captured during the 1960s in the Bengali middle-class.

হাংরি জেনারেশনের কবি ফালগুনী রায় ক্রমশ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করছে। সেটা শুধু সাম্প্রতিককাল থেকে হচ্ছে। তাঁর কবিতা ক্রমাগতভাবেই ভারত এবং বাংলাদেশের পোপ কালচার-এ প্রবেশ শুরু করে। গ্রাফিক নভেল-এ "গাণ্ডুর মুণ্ডু", পরিচালক কিউ-এর ("Q") মুভি "গাণ্ডু"-র একটি গ্রাফিক ধারাবাহিকতা, রেপ সংগীত গায়ক তার স্বপ্নে ফালগুনীর কবিতাকে দেখে। কিউ পরিচালক যাদুবস্তবতাবাদী লেখক নবারুণ ভট্টাচার্য্যের বিষয়ে একটা তথ্যচিত্র করেছে। তথ্যচিত্রের শুরুতেই, হাংরি জেনারেশনকে ১৯৬০ দশকের বিদ্রোহের একটি স্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। বইয়ের লেখক এবং কথক সুরজিত সেন নিজের কথাগুলোতে বলেছেন যে "ফালগুনী তাঁর সময়ের গাণ্ডু ছিলেন", অথচ যেটাকে আমরা একজন বোকা, গাঁধা এবং ফালতু নাম করি। অর্থাৎ সমাজ দ্বারা অস্বীকৃত 'অস্বাভাবিক' এবং অনিয়মিত ব্যক্তির প্রতীক।

এই লেখক ফালগুনীর কলকাতার ভূগর্ভস্থানের সাথে সংযোগ সম্পর্কে অনেক কিছু প্রকাশ করে। কিছু সময়ের জন্য তিনি অংশ নিয়েছিলেন হাংরি জেনারেশনে, অশ্লীল, অসভ্য এবং ক্ষুধিত কবিদের একটা আভাঁগার্ড আন্দোলন যারা তাদের সহিংসতা, যৌনবিকৃতি, বিচ্ছিন্নতা এবং উত্তর-আধুনিক যন্ত্রণার ভাষা নিয়েই কলকাতার এস্তাব্লিশমেন্টকে ধাক্কা করা চেষ্টা করছিলো। ফালগুনী এবং অন্যান্য ক্ষুধার্ত কবিদের নাস্তিকবাদী, মিসোজিনিস্ট, অরাজনৈতিক বলে সঞ্চিত করা হয়েছিলো। তারা ছিলেন পুরুষ বাঙালি মধ্যবিত্ত যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। হাংরি আন্দোলন প্রায় এক দশক ধরে বেঁচে ছিল অন্তত ১৯৬৪ সালের পর্যন্ত যখন আন্দোলনের সদস্যগণ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত ছিলেন। অথচ তাদের উত্তরাধিকার এখনও শহরের নোংরা ভূগর্ভস্থানে লুকিয়ে থাকে। অশ্লীলতার বিচারের পরে, কয়েক জন কবি ও গদ্যকার লেখা ছেড়ে দিয়ে তাঁর জীবনে অন্যান্য ধর্মীয় বা রাজনৈতিক পথ অবলম্বন করেছেন। হাংরি লেখকের মধ্যে কয়েক জন আন্দোলনে রয়েছেন বা কয়েক অন্য দলে যোগ দিয়েছেন, কৃত্তিবাস আন্দোলনের মতো। ফালগুনী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আজকে তিনি আমাদের জন্য কেবল একটি কাব্যসংগ্রহ রেখে দিয়েছেন—*নষ্ট আত্মার টেলিভিসন* । তিনি বেকার, মদে আসক্ত, এবং

সিরোসিস আক্রান্ত এক মানুষ ছিলেন আর ১৯৮১ সালে তিনি ৩৬ বছর বয়সে অকালে মারা গেছেন।

এই গবেষণাপত্রে আমি পাঠকের সাথে ফালগুনীর সংগ্রহের কয়েকটি পদ্য পড়ে আলোচনা করতে চাই, যাদের মধ্যে আমরা খুঁজে দেখতে পাবো সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বশীল বিষয়গুলো এবং ভাষালংকার—বিদ্রূপ, দ্বন্দ্ব, দ্ব্যর্থতা এবং উদ্বেগ—যা ফালগুনীর কবিতার বুকে রয়েছে। এই আর্থিক দুশ্চিন্তা, দৈহিক এবং মানসিক নিরাপত্তাহীনতা বলেই ফালগুনী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিদ্রোহী নায়কের সাথে তুলনা করে দেখা উচিত: মধুসূদন, নবারুণ, রাঁম্বোঁ, বদলেয়ার প্রমুখ। ফালগুনীর জীবনের (১৯৪৫-১৯৮১) খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু যতটা আছে তা বিশেষকরে তাঁর কবিতায় এবং হাথরি সংগ্রহের মধ্যে টুকরো করে পাওয়া যায়। তিনি বাংলাদেশের নড়াইল জেলায় এক অভিজাত পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন। দেশভাগের পরে তারা উত্তর কলকাতার বরানগরে চলে আসেন, সেখানে রতনবাবুর রোডে পরিবারের বসতবাড়ি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর এক দাদা ছিলো, যার নাম তুষার রায়। তিনিও একজন সুপরিচিত কবি ছিলেন। তবু তাঁর ভাইয়ের মত মদ্যপান এবং নেশায় আসক্ত। তার কারণে তিনিও অকালে মারা গেছেন। ফালগুনীর কবিতায় পাঠকরা কলকাতার নতুন একটা ভূগোল তৈরি করতে পারবে যেটা কবির সবচেয়ে প্রিয় জায়গা সংযোগ করে: খালাসি টোলায় দারুর দোকান, হাড়কাটা ও সোনাগাছির রেড লাইট এলাকা, কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস, গঙ্গার তীরে নিমতলা ঘাট, এবং পার্ক সার্কাস ক্যাথলিক কবরস্থান।

আমি ফালগুনীর প্রত্যেকটি কবিতাকে তাঁর জীবনের দৃশ্য এবং বাস্তুগত 'টুকরো' (fragment) হিসাবে ব্যবহার করবো। আমার মনে হয় যে এই 'টুকরো' ধারণাটি এই কবির উপরে যতটা আমরা জানি খুব স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করে: মানে এই যে জ্ঞান অতি-খণ্ডিত এবং অসম্পাদিত উৎস বা বিক্ষিপ্ত কাগজপত্র থেকে আসে। এমন একটা জ্ঞান আমি পূর্ণভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করবো না। আমি বরং সেটাকে 'ডি-কনস্ট্রাক্ট' করতে চেষ্টা করবো। খণ্ডিত হলো তাঁর কবিতার ভাষা এবং কাঠামো, যা ইচ্ছাকৃতভাবে পুরনো ছন্দকে প্রত্যাখ্যান করে আর কবির 'চিন্তার ধারা'কে গদ্য বা মুক্তছন্দের (free verse) কাছে সামঞ্জস্য করে। সুতরাং ব্যাকরণ, অভিধান এবং চিন্তার খণ্ডন-ই এই সংগ্রহের মূল চিহ্ন। এই খণ্ডন বিশেষকরে দেখা যায় বাক্য-নির্মিতিতে, যেখানে যতিচিহ্ন প্রায় অনুপস্থিত। এর ফলে বাক্যগুলি হোঁচট খায়। তার বদলে ফালগুনীর ভাষা গালি, চিৎকার এবং চলিত অভিব্যক্তিপূর্ণ। অথবা চলিত বাংলা ছাড়াও তিনি অনেক জায়গায় শুদ্ধ বা উচ্চ পরিভাষা ব্যবহার করেন, বিশেষকরে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসাবিদ্যার পরিভাষা।

প্রায় সময় এই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিদ্রূপাত্মক উদ্দেশ্যসহ ব্যবহৃত হয়। বিড়ম্বনা, বিদ্রূপ এবং কূটাভাস ফালগুনীর ভাষায় প্রধান রীতি এবং ভাষালংকার বলেই আমরা এই লেখকের নন্দনতত্ত্বকে পুরোপুরি উত্তর-আধুনিক সংজ্ঞা দিতে পারি। এখন তাঁর

ফালগুনী রায়ের কাব্যসংকলন নষ্ট আত্মার টেলিভিসনের *প্রচ্ছদ*

কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা চেয়ে দেখে ঘনিষ্ঠভাবে পড়বো এবং পদ্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থ বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবো।

১
শুধুই রাধিকা নয়—গণিকাও ঋতুমতী হয়
তিন সন্তানের পিতা—পরিবার পরিকল্পনার আদর্শপুরুষ
কৈশোরে করে থাকে আত্মমৈথুন—করে না কি

২
আমি রবীন্দ্রনাথ হতে চাই না—হতে চাই না রঘু ডাকাত
আমি ফালগুনী রায় হতে চাই—শুধুই ফালগুনী রায়

৩
আমি যে রাস্তায় থাকি তার একপ্রান্তে প্রসূতিসদন অন্যপ্রান্তে শ্মশানঘাট
বিশ্বাস না হয় দেখে যেতে পারেন—বাস রুট ৪, ৩২, ৩৪, ৪৩

৪
ম্যাগাজিন শব্দটি আমি লক্ষ্য করেছি রাইফেল ও কবিতার সঙ্গে যুক্ত
("ব্যক্তিগত বিছানা")

ফালগুনীর কবিতা ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল বলেই তাঁর লেখা 'আধুনিক' এবং স্বাধীন ভারতীয় গণতন্ত্র পটভূমিতে পড়া উচিত। সেদিন নেহেরু পাঁচ বছরের পরিকল্পনা (Five-Year Plan) আধুনিক ভারতের জাতীয় গঠনের জন্য উনি প্রগতি এবং উন্নয়নকে প্রচার করেছেন, যার মধ্যে পরিবার পরিকল্পনাও পড়েছে। ষাটের দশক ভারতের সীমান্তে যুদ্ধের সময়কাল ছিল, চীন ও পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। দেশভাগ পরে অনেক কিছু ঘটেছে: পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর উদ্বাস্তু কলকাতায় এসেছে; মধ্যবিত্ত যুবকদের মধ্যে ভীষণ চাকরির অভাব; ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির (CPI) বিভক্ত হওয়া; নকশালের সংগ্রাম পাহাড় থেকে শহরে পৌঁছে গিয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনা বাঙালির মধ্যবিত্ত (এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক) মানুষের জন্য বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার মানে রেখেছিল।

এই সব শিল্পসংক্রান্ত ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং ভারতবর্ষের ভোগের সংস্কৃতির পটভূমিতে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট ফালগুনীর শরীর নাড়িয়ে দিয়েছিল। সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে 'স্বাভাবিক' এবং অস্বাভাবিক কী, তা বোঝানো ছিল তাঁর কবিতার লক্ষ্য। যৌনতার ক্ষেত্রেও এই দ্বন্দ্ব তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় অবস্থানে ছিল। এই সমস্ত কারণে আমরা বলতে পারি যে ফালগুনী বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের প্রান্তিক একটা অবস্থানে ছিলেন। তিনি আসলে একজন 'বোহেমিয়ান' কবি: অবিবাহিত, মদ এবং

ফালগুনী রায়ের রচনাসংকলনের দুটি প্রকাশনার প্রচ্ছদ

ধূমপানে আসক্ত, যার যৌন দৃষ্টিভঙ্গি অস্পষ্ট এবং বিশৃঙ্খল। সুতরাং তাঁর অস্বাভাবিকতা বোঝাতে তাঁর লেখা বর্ণ ও শ্রেণি অস্বীকার করেছিল, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাবিদ্যার নিয়ম ভাঙতে চেষ্টা করেছিল, এবং আধুনিক ভারতীয় সমাজের উপযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। তিনি লিখেছিলেন—

> আমি নেশাগ্রস্থ তাই সংসারী সাত্বিক বন্ধুরা দূরত্ব বজায় রাখে ঠিক
> ট্রামে ট্রেনে বাসে ফুটপাথে - আমি আন্দাজ মেপে কথা বলতে
> পারিনা কিছুতেই একজন ঘরের বউ দেখলুম বহুগামিতায়
> বেশ্যাদের ছাড়িয়ে গেল
> পয়সা ছাড়াই - আমার হাহাকার ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিলুম অট্টহাসি
> প্রেমিকার চোখে চোখ রাখতে গিয়ে দৃষ্টিফেটে একশো বিষাক্ত সাপ
> চলে গ্যালো তার দিকে - আমি পুরোহিতের মন্ত্রপুত টিকিতে
> গোমাংস ঝুলিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলুম ধর্মসংস্কারের সহ্যক্ষমতা
> ("ক্রিয়াপদের কাছে ফিরে আসছি" থেকে)

এই সংগ্রহের মূল কাব্যচিত্র হচ্ছে ফালগুনীর পুংলিঙ্গ শরীর যেটা সবসময় কবির 'ক্লিনিকাল' (রোগশয্যা) দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন এবং বিশ্লিষ্ট হয়। মনে হয় যে তাঁর পুংলিঙ্গ

শরীরের সাথে কঠিন এবং দ্বন্দ্বপূর্ণ সম্পর্কে যুক্ত। সুতরাং ফালগুনীর সংগ্রহের মূল বিষয়টি এবং সমস্যা হচ্ছে মধ্যবিত্ত বাঙালীরার পুরুষত্বের যন্ত্রণা, যেটা সবার আগে উল্লেখযোগ্য। ফালগুনী তাঁর পুরুষাঙ্গের দিকে একটানা চেয়ে তাকিয়ে থাকে, তাঁর পুরুষাঙ্গের কাজকর্ম এবং যৌন আবেগের প্রতি অঙ্গের প্রতিক্রিয়া পরিদর্শন করেন। আমরা আগে বলেছিলাম যে, দেশভাগের পরে তিনি পুরোনো বাঙালি অভিজাতের জগত থেকে কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির নতুন বিশ্বের পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। সেইজন্য আমরা বলতে পারি যে, তিনি সেকালের নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সুরক্ষার সংকটের একজন সাক্ষি ছিলেন। এই অস্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা ফালগুনীর অস্পষ্ট যৌন ঝোঁকেও দেখা গিয়েছিলো, যেটা সবসময় কবির নজরে পড়ছে। পরবর্তী পদ্যগুলোতে ফালগুনীর নিজের সমকামী টানকে প্রকাশ করার প্রয়াসে পাঠকরা টের পাবেন কবির 'অসমাপ্ত মানুষের' কষ্টকর অবস্থা: তিনি স্বামী এবং পিতার সামাজিক ভূমিকা পালন করতে অক্ষম। ফালগুনী লিখেছেন—

> মা, আমি আর তোমাদের অভিজাত সমাজের মাজাঘষা বাঁকাহাসি হাসতে পারবো না করুণাঘন ঈশ্বরের ক্যালানেকেষ্ট সাদাদাঁত নিয়ে শয়তানের মেধাবী চোখ নিয়ে আমি আর পারবো না রামকৃষ্ণীয় ভংগীতে স্ত্রীকে ব্যবহার করতে মাতৃতান্ত্রিক প্রথায়
>
> চিনির বদলে স্যাকারিন খেয়ে ডায়বেটিসকে ভয় করতে পারবো না আমি পারবো না অসুখী লিঙ্গ নিয়ে প্রাক্তন প্রেমিকার গায়েহলুদের দিন দেবদাস হতে খালাসীটোলায়
>
> আমার লিভার ক্রমশঃ পচে আসছে আমার পিতামহর সিরোসিস হয়েছিল হেরিডিটী বুঝিনা আমি মদ খেয়ে কবিতা পড়ি আমার বাবা পূজোআচার জন্যে করতেন উপবাস পাড়ার দাদারা ধর্মের দোহাই দিয়ে দোলের দিন টিপে দ্যান পাড়াতুতো বোনদের মাই
>
> মা বিদেশ ভ্রমণের দিন তোমাদের অভিজাত সমাজের অনেকেই ভদকা গিলেছেন আমি নির্বিকার তোমার চিতা থেকে ধরাবো চার্মিনার
>
> তোমার মৃত্যুর কথা ভাবলে আমার চোখে জল আসে তখন আমি ভূমির ভূমিকম্প কিম্বা জলের জলোচ্ছ্বাসের কথা ভাবিনা কুমারী প্রেমিকার শায়ার দড়িতে হাত রেখে আমি বৈষ্ণব পদাবলীর কথা ভাবিনি মা আমিও মরে যাবো একদিন
>
> বেলুড় মন্দিরে প্রণামরতা এক বিদেশীনির স্কার্ট ঢাকা আন্তর্জাতিক পাইথনপাছা দেখে জেগেছিল আমার সীমাহীন যৌনতা মা তোমার যৌনতা আমৃত্যু বাবার চিতার সঙ্গে লেপ্টে থাকবে বলে আমি তোমায় ঈর্ষা করছি

> নিরহংকার নোংরামি নিয়ে লিঙ্গের দিকে তাকিয়ে নিজেকে অন্যগ্রহের জীব মনে হচ্ছে এখন আমার মুখের ওপর এসে পড়ছে ডুবন্ত সূর্য্যের আঁচ আর সূর্যাস্তের রং পাখায় মেখে পরিবার পরিকল্পনাহীন পাখির দল ফিরে যাচ্ছে বনলতা সেনের চোখের শান্তিময় নীড়ের দিকে-ডিমে তা দেবার সময় এসেছে তাদের
>
> ("নির্বিকার চার্মিনার")

পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ব এবং 'স্বাস্থ্যকর' পুরুষত্বের এই চিত্রগুলি ফালগুনীর প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘৃণায়, উপহাসে ও উল্টো ভাবেই ব্যবহার করা হয়। তাঁর লিঙ্গ তাঁকে জৈবিকভাবে মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করে। তবু লিঙ্গ এমন একটা বস্তু যা অন্যান্য বস্তুর মতো দেখে মনে হচ্ছে যেন তা শরীরের অঙ্গ নয়। ফালগুনীর "নিরহংকার" এবং "নোংরামি" দিয়ে তাকান তাঁর নিজের পুরুষত্বের গুণের জন্য কবির বিকর্ষণ অনুভূতি প্রকাশ করে। তিনি নিজের দেহকে প্রতিবন্ধক হিসাবে মনে করেন যেটা তাঁর যৌন এবং প্রান্তিক সামাজিক পরিচয়ের সম্পূর্ণ প্রকাশের বাধা দেয়। ফালগুনী তাঁর পুরুষ দেহের সাথে অ-পরিচয়ের ফল হলো তাঁর অন্যতার অনুভূতি। সেটা সামাজিক নিয়মগুলির স্বাভাবিকতার তুলনায় তৈরি হয়েছিল: এ কারণেই তিনি নিজেকে "অন্যগ্রহের জীব" মনে করেন, একজন এলিয়েন বা দৈত্যের মতো।

এখন ফালগুনীর কবিতায় আরেকটি কেন্দ্রীয় চিত্রে এগিয়ে যাওয়া যাক, অর্থাৎ 'হেরেদীটির' (heredity) ধারণা। হেরেদীটি হচ্ছে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনীয় তত্ত্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় উপলব্ধিতে ইউজেনিক্সের (eugenics) মূল নীতি। পরের কবিতায় আমরা দেখতে পাবো 'বীর্য' এবং 'ভ্রূণকোষের অ্যাসিডগুলি'র লক্ষ্যায় বিজ্ঞানের ভাষাকে মজা করা এবং উল্টে ফেলার অভিপ্রায় লুকিয়ে থাকে।

ফালগুনীর কবিতায় এইরকম বৈজ্ঞানিক চিত্রগুলি আরও কিছু ইঙ্গিত দেয়, অর্থাৎ 'সঠিক' যৌন আচরণের উপরে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রভাব। ইউজেনিক্স এবং মালথুসিয়ানিজম নেহেরুর ভারতবর্ষে প্রধান মতবাদ হিসাবে পুনরায় উপস্থিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে ভারতে এই দুটো ভাবধারা একটা নতুন সমাজের বিবর্তনীয় আদর্শ লালন করেছিল যেটা রক্তের সম্পর্কের উপরে ভিত্তি করে। বর্ণ ও পরিবার নিয়ে হিন্দু জৈবিক দৃষ্টির মতো একটা সমাজ। বর্ণ ও সমাজ সম্পর্কে এই সমস্ত হিন্দু মধ্যবিত্ত আদর্শগুলো ফালগুনীর জন্য তল্লাসের উৎস ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতকে মাথায় নিয়ে ফালগুনী লিখেছেন—

> একটু অন্যভাবে দিনরাত কাটিয়ে আমার বাঙ্গালী বাবা মা জন্ম দিয়েছেন আমায় সময়ের ভেতর অর্থাৎ বাবার শরীর মায়ের শরীরে দুই শরীরের মিলনে আমার একটি শরীর অর্থাৎ দ্বৈত থেকে অদ্বৈত হওয়া এভাবেই পিতা

> হবার ইচ্ছাকে আমরা লক্ষ করি স্বইয়ংরতির ভেতর তরল বীর্যস্রোতে দুশো ছয় হাড়ের কাঠামো ও কাঠামোর সংলগ্ন মাংসল স্নায়ুর চিন্তাবাহন শব্দের স্মৃতিধারণের বীজ তরল বীর্য্যের ভেতর
>
> ("নষ্ট আত্মার টেলিভিশন" থেকে)

এই পদ্যগুলো পড়ে মনে হচ্ছে কিভাবে ফালগুনী বিজ্ঞান এবং হিন্দু জ্ঞান নিয়ে মজা করেন। আসলে দুটোই জন্ম, যৌনতা ও বিবাহের উপর বিশ্বাস ও নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে স্বাস্থ্যবিধি, জাতিগত শুদ্ধতা এবং শ্রেণিপার্থক্য একটা জাতীয় আদর্শ প্রচার করে থাকে। আমরা নিচে দেখতে পাবো আমাদের কবি হেরেদীটি ধারণার উপরে কিরকম উপহাস বা বিদ্রুপ তৈরি করেন। পরের পদ্যগুলোতে ফালগুনী উপর্যুক্ত "ভ্রূণকোষের অ্যাসিডগুলি" উল্লেখ করার সময় তিনি মানুষ শরীরের গঠনের উপরে হেরেদীটির প্রভাব সমালোচনা করতে চান। হেরেদীটি-পরিবেশ সমস্যার প্রসঙ্গে, ভাষা হচ্ছে ফালগুনীর জন্যে বিশ্লেষণের মূল বিষয়। ফালগুনী বিস্ময়করভাবে তাঁর নিজের সামাজিক দেহে— মানে একজন বেকার, সিরোহোটিক এবং মদ্যপ বাঙালি মানুষের দেহে - জন্মগ্রহণের জৈবিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষু করেন। অর্থাৎ হাংরি কবি এখানে ভাবতে থাকেন যদি এক মানুষের শিক্ষা, শ্রেণি বা সমাজের স্থিতি তার পরিবারের জৈবিক বা জেনেটিক উত্তরাধিকার উপর নির্ভর করে। ফালগুনীর কথায় ব্যাঙকাব্য রীতিতে জাতি ও পরিবারের ধারণাকে—উভয়ই মায়ের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারের জৈবিক তত্ত্বের উপর স্থাপন করে—সমালোচনা করে। এই উপলব্ধি থেকে ফালগুনী লিখেছেন—

> কি আশ্চর্য মিষ্টার খান্না - হিন্দীভাষী কিন্তু কিমাশ্চর্য তার স্ত্রী বাঙ্গালী হওয়ার মিষ্টান্ন খান্নার পাঁচ বছরের ছেলে বাঙ্গালী হিন্দি দুটোই বলতে পারে জিভ দাঁত তালু কণ্ঠ ওষ্ঠের সম্যক ব্যবহার আচ্ছা সেকি তার ভ্রূণকোষের অ্যাসিডগুলির ভেতর নিয়ে এসেছিল তার কথা বলা ও বুঝার ক্ষমতা প্রিয় হেরেডিটী ভাষা জিনিসটা কি হেরেডিটী - পরিবেশ না প্রয়োজন কার দরকার ভাষা গঠনে - ভালোবাসার ভাষা আছে কিনা জানিনা তো হেরেডিটী অনুভূতি শুধু দেখি একই কায়াবিশিষ্ট মানুষ কেউ হতে চাইছে জেমসজয়েস কেউ আলামহন দাস অথচ কাউর জন্মের ওপর তার নিজের কোন হাত নেই কোন সুজুকির জন্মের পেছনে বুদ্ধের কোন হাত ছিল কি?
>
> আমার সাহেব মেম বন্ধুবান্ধবীরা তোমরাও বাঙলা জানানো জন্মসূত্রে যেমন অনেক বাঙ্গালী জন্মসূত্রে জানে না ইংরিজি তোমাদেরও খিদে পায় বাড়ি খোঁজার সময় তোমরাও দ্যাখো পায়খানা বাথরুম আমাদের মত ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ করো তোমরা আমাদেরই মত অ্যালেন গীন্সবার্গ স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে দেখতে পান তার কবিতার নদী তবু শালা আমি

> বাঙ্গালী ম্যাক্সমুলার পড়ে জানবো শতপথ ব্রাহ্মণের ভগবান তাই সম ও সুরা মানে সিদ্ধি ও মদ পান করবো একযোগে প্রায়শ সন্ধ্যায় আর বুদ্ধদেব বসু হাংরিদের নিরক্ষর বলে বীটবংশের ওপর লিখবেন ধীমান প্রবন্ধ—হায় আমার চিন্তার ভাষা কেন ইংরিজি হোলনা কেন আমার বাবা মা বাঙ্গালী—হায় বাঙালী কেন বল তুই কবি হলি—
>
> ("নষ্ট আত্মার টেলিভিশন" থেকে)

বিজ্ঞান এবং ধর্মের নিয়মের বিরুদ্ধে, ফালগুনী শারীরিক অনুভব বদলে ('অনুভূতি') একটি প্রেম ভাষার ('ভালবাসা') প্রস্তাব করেন। ভারতীয় আধুনিকতার মূল চিন্তাধারণায় তাঁর বিদ্রূপ নেহেরুর প্রচারিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আখ্যানের সাথে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার নিয়ে ধারাবাহিকতা উন্মোচন করেন। উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে তিনি ইংরেজি ভাষার উঠন্ত ক্ষমতা জানতেন, বিশেষকরে সাহিত্যিক ক্ষেত্রে, যেটা আধুনিক লেখকদের জন্য দৃশ্যমানতা এবং মুক্তির এক আবশ্যক উপকরণ ছিল। তবু ফালগুনী তার নিজের চিন্তার ভাষাকে সন্ধান করতে চেয়েছেন—আন্তর্জাতিক ভাবনা এবং অনুভূতির 'ব্যক্তিগত' একটি ভাষা—যার মাধ্যমে তিনি প্রচালিত শব্দ ও অর্থকে ধ্বংস করে আবার লিখতে পারেন। উপরের পদ্যগুলোতে, তাঁর নিজের ভাষাতাত্ত্বিক

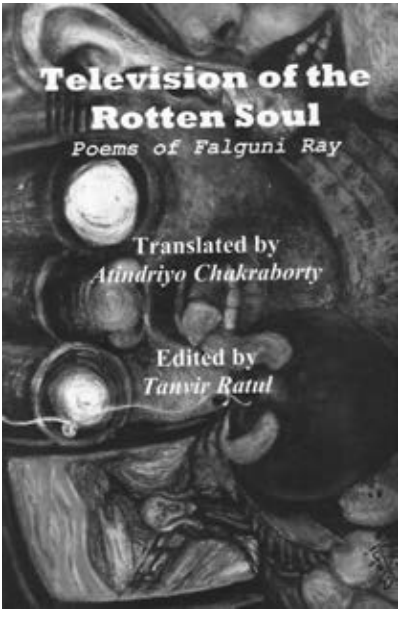

ফালগুনী রায়ের সাহিত্যকর্মের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থের প্রচ্ছদ

ফালগুনী রায় আমার রাইফেল আমার বাইবেল-*এর প্রচ্ছদ*

'সাদা-হীনতা' দেখে ব্যথিত বলে মনে হচ্ছে। এমন একটা রাগের কষ্টকে তিনি নামমাত্র বাক্য দিয়ে নির্ধারণ করেন: "তবু শালা আমি বাঙালী", একটি বাক্য যে কবির আগের কথন প্রতি কাউণ্টেরপয়েন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যে দ্বন্দ্বগুলি উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ বলে এই বাক্যটি তাকে স্পষ্ট করে দেয়। ফালগুনী উত্তর-ঔপনিবেশিক মানুষের একজন প্রতিনিধি যিনি এখনও অনিবার্যভাবে ঔপনিবেশিক অতীতের সাথে আবদ্ধ। একই অতীত যা পশ্চিম বাংলার ষাটের দশকের মানসিক, সামাজিক, এবং জীবনের সংঘাতগুলোকে সৃষ্টি করেছিল।

কবি যে কূটাভাসকে তিনি জোর দিয়েছেন তা হলো সেকালের বাঙালী লোকের উপরে ঔপনিবেশনের ধারাবাহিকতা। তার মূল কারণ হলো ভাষায়, সাংস্কৃতিক আচরণে এবং পশ্চিম থেকে নেওয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলিতে। আসলে কবি ডিকলোনাইজেশন আন্দোলনের সময় উত্থাপিত বিতর্কগুলির গ্রহণক্ষম হতে দেখিয়েছেন। সেগুলো পশ্চিম ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের কর্তৃত্ব সন্দেহ করেছিল। যেকোনো ভাবে আমরা বলতে পারি যে ফালগুনী তাঁর কবিতায় পোস্টকলোনিয়াল স্টাডিস (Postcolonial Studies) মূল প্রশ্নগুলিকে—বিশেষকরে পশ্চিম জ্ঞানের পদ্ধতিকে সংশয় করা—পূর্বেই দেখেছিলেন। যেমন ভাষায় এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিচয় সম্পর্কে ফালগুনীর কিছু পর্যবেক্ষু ফ্র্যান্টজ ফ্যাননের উপনিবেশ স্থাপনকারীর দৃষ্টির ধারণার সাথে—তাঁর লেখায় "সাদা লোকের চক্ষু"—অনুরণন করে। যে চক্ষু "কালো ব্যক্তিকে স্থির" এবং "ব্যবচ্ছেদ" করতে থাকে (Fanon 1986: 116)। কবির লক্ষ্য হচ্ছে উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে—নতুন একটা চক্ষু—বাংলা ভাষা ও কবিতাকে সমৃদ্ধ করা শব্দের খেলা, নতুন অর্থ এবং ইংরেজি শব্দ দিয়ে দূষণের মাধ্যমে। ফালগুনীর লেখাতে পাওয়া যায়—

> জরায়ু সম্পর্কে আমি কিছু বলার আর্জ ফিল করছি, আসলে ভাষার ভেতরে শব্দরা যেমন দেশি-বিদেশি গন্ধ ভুলে যায়, চশমার ফ্রেম বদলাবার সময় যেমন মনে থাকে না 'ফ্রেম' এটা ইংরেজি শব্দ তেমনি অনেক সময়ে প্রকৃত লেখার ভেতরে মানুষেরা মিশে গেলে ফের লিখে ফেলার ব্যাপারটাই ঘুচে যায় অনেক সময় অনেক সময় বিমূর্ত ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার ফলে মানুষ বিমূর্ত চিত্রকলা কবিতা সাহিত্য এবং বিমূর্ত চলচ্চিত্রের কাছে চলে যায় - চলমান চিত্র জীবনের রয়েছে, এ বোধ উবে যায় অনেক সময় যে দ্রষ্টা সে নির্বিকার নির্লিপ্ত, যার মাধ্যমে দেখা হচ্ছে সে সচল
>
> ("অন্তিম জরায়ু" থেকে)

অবশেষে তাঁর কবিতা পড়ে আমি এক প্রধান ব্যাখ্যার কাঠামো লক্ষ্য করেছি। সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানের ভাষা এবং পদ্ধতিগুলির শুষ্কতার ফালগুনীর প্রত্যাখ্যান। এছাড়াও ভাষা বাস্তবতাকে একক অপরিবর্তনীয় সত্তা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার ধারণার প্রতিও

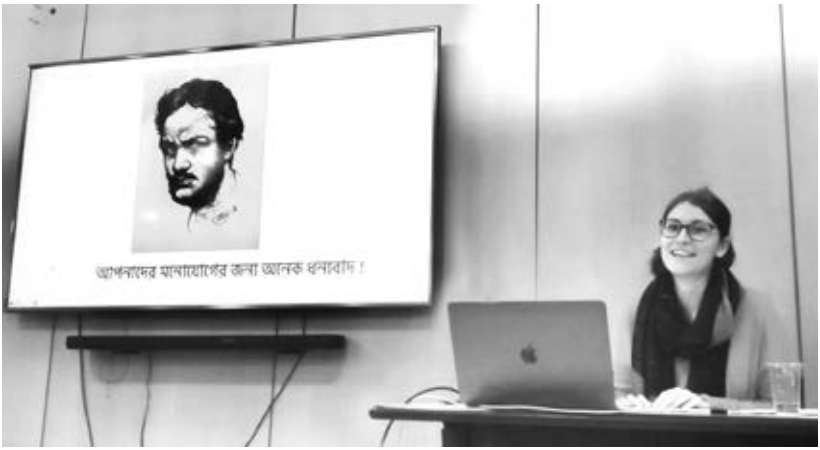

ফ্রান্সে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্যারিস সেন্টারে বক্তৃতারত ডানিয়েলা কাপ্পেল্লো

কবির প্রত্যাখ্যানের মনোভাব দেখা যায়। এইভাবে ভাষা বিচিত্র জিনিসের জন্য—জাতি, ধর্ম, শ্রেণি বা লিঙ্গ—তার একক অর্থ স্থাপন করে থাকে। আমি এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ এমন একটি স্তবকের সাথে বন্ধ করতে চাই যেটাকে ভারতবর্ষের হিজমোনিক মতবাদের উপরে—অগ্রগতি, বিজ্ঞান এবং পরিবার ও জাতি সম্পর্কিত আচার-বিচার—ফালগুনীর সংশয় এবং প্রত্যাখ্যান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। তাঁর লেখার ও জীবনের শিক্ষা অবশেষে কেবলমাত্র একটি প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত করতে পারে: এই পোস্টমডার্ন সমাজে আমরা মানুষ কে? ফালগুনীর কবিতায় পাওয়া যায়—

নাগরিক নিয়নের আলোয়
আমার একক ছায়ার পাশে
তোমার একাকী ছায়ার বদলে
আমার শরীরে এক ল্যাজ
("কালো দিব্যতা" থেকে)

সুতরাং যৌনতা, ভাষা এবং পুরুষত্ব হল এমন কিছু যন্ত্রগুলো যাকে আমাদের কবি ভারতবর্ষের উত্তর-আধুনিকতার সঙ্কট বোঝার জন্য ব্যবহার করেছিলো। কবির পুরুষ শরীর এবং বাংলা ভাষা দুটোই—সবসময় সীমালংঘনের স্থানে উপস্থিত - তাঁর উত্তর-ঔপনিবেশিকতার জিজ্ঞাসাবাদের কেন্দ্রে। এই যন্ত্রগুলো দ্বারা ফালগুনীর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর নিজের 'বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি'র অর্থগুলো—যাকে হাথরি লেখকের ঝাঁকিয়ে পুনর্জন্ম দিতে চেয়েছিলেন—পুনরায় লিখতে চেয়েছিলেন। অথচ একটি উদ্দেশ্য যেটাকে আমাদের 'পাগল' কবি জাতি, লিঙ্গ এবং শ্রেণির প্রভাবশালী দৃষ্টিগুলো এবং আচরণকে মজা করার মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা.) ২০১১। *হাথরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন*। সাতটি প্রতিষ্ঠানবিরোধী সংখ্যা। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

ঘোষ, শৈলেশ্বর ২০১১। *হাথরি জেনারেশন সত্যমিথ্যা*। কলকাতা: কারুবাসনা।

দাস, উত্তম ১৯৮৬। *হাথরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন*। কলকাতা: মহাদিগন্ত।

মিশ্রা, বৈদ্যনাথ (সম্পা.) ২০১৫ [বং. ১৪২২]. *চন্দ্রগ্রহণ: ফালগুনী রায় এবং কিছু লেখালেখি*. ১১:২৩. কোলকাতা: চন্দ্রগ্রহণ।

সুরজিত, সম্বরন, Q 2019। *গাণ্ডুর মুণ্ডু*। Kolkata: Oddjoint.

সেন, সাব্যসাচি (সম্পা.) ২০১৫। *হাথরি জেনারেশন রচনা সংগ্রহ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

ইংরেজি

Fanon, Frantz 1986 [1952; 1967]. *Black Skin White Masks*. London: Pluto Press.

Ratul, Tanvir (ed.) 2015. *Television of a Rotten Soul: Poems of Falguni Ray,* transl. by Atindriyo Chakraborty. Liverpool: Antivirus.

Sinha, Mrinalini 1995. *Colonial Masculinity: The manly Englishman and the effeminate Bengali*. New Delhi: Kali for Women.

Srivastava, Sanjay 2014. "'Sane Sex', the Five-year Plan Hero and Men on Footpaths and in Gated Community: The cultures of twentieth-century masculinity". In Dasgupta, Rohit K. and Gokulsing, Moti (eds.) 2014. *Masculinity and its Challenges in India: Essays on changing perceptions,* pp. 27-53. Jefferson: McFarland.